Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 260–269
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ওড়িয়া কাব্যে রবীন্দ্রনাথ : একটি অনতিদীর্ঘ পরিক্রমা

অভি কোলে
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
ইমেল : abhikoley.bangla485@gmail.com

Keyword
রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ওড়িয়া পাঠক, ব্রহ্মবাদী ভাবনা, আধ্যাত্মবোধ, ওড়িয়া সাহিত্যের সবুজযুগ, সবুজের অভিযান, মানব প্রেমের বাণী, সৌন্দর্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ, সমন্বয়ের সেতু, কর্মযোগী ঋষিকল্প।

Abstract
ভারতাত্মার বাণীসাধক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দি, মারাঠি, উর্দু, তামিল প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যে মুগ্ধ ও প্রাণীত হয়েছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িষ্যার সঙ্গেও কবির সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি উৎসাহ ও কৌতুহল বাড়তে থাকে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির উত্তর সময় থেকেই। ওড়িষ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য শাখা সাফল্য অর্জন করলেও রবীন্দ্র কবিতায় ওড়িষ্যায় সমাধিক পঠিত ও সমাদৃত। ওড়িষ্যা রাজ্যের পান্ডুয়া নামক জমিদারীর কর্তা রূপে রবীন্দ্রনাথ ওড়িষ্যা যাত্রা করেন। 'সিন্ধুগর্ভ', 'সমুদ্র', 'সিন্ধুতীরে' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির ওড়িশা বাসের সময়কালে স্থাপত্য- শিল্পকলার পরিচয় বহন করে। 'উৎকল ব্রাহ্মসমাজ' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ওড়িয়া সাহিত্যের ভক্ত কবি মধুসূদন রাও এর 'ঋষিচিত্র' পত্রিকায় অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ সালে তাকে শান্তিনিকেতন আহ্বান করেন ব্রহ্মবাদী মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ঔপনিষদিক ভাবনা দুই কবিরই কবিতাকে বিশ্বনিয়ন্ত্রা অসীম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ও অকপটে সর্বস্ব নিবেদনের সুরধ্বনিত। দুজনের রচনাতে ঈশ্বরের নিকট যে আত্মনিবেদন, আকুলতা এবং গভীর বিশ্বাস পাওয়া যায় যার মূলে ছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রতি উভয়ের আন্তরিকতা ও আনুগত্য।

বিশ শতকের সময়কালে দাঁড়িয়ে ওড়িয়া কবিতায় মধ্যযুগের বৈষ্ণবীয় ভাবমন্ডলের আর এক কবি লক্ষীকান্ত মহাপাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের সঙ্গে আধ্যাত্মবোধের নিরিখে ভাবগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়বে কবি লক্ষীকান্তর 'জীবনসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে। যদিও 'জীবনসঙ্গীত' অধিক ব্যক্তিনিষ্ঠ। ঝড় ও অন্ধকার রাতে রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তরতমের জন্য অভিসারের অপেক্ষায় অনিদ্র প্রতীক্ষায় থেকেছেন, তেমনই কান্তকবি লক্ষীকান্তও থেকেছেন।

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যের ১ সংখ্যক কবিতা 'সবুজের অভিযান' প্রকাশিত হয়। সমস্ত কিছু জড়তা, সংকীর্ণতা, পুরাতন পন্থা ও গোড়াঁ মনোভাব ত্যাগ করে নব উদ্দামতা প্রাকৃতিক সবুজের মতো সতেজ প্রাণশক্তিকে জেগে ওঠার আহ্বানে অন্নদাশঙ্কর রায় 'সবুজ সাহিত্য সমিতি' গঠন করেন ১৯১৯

সালে। কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক প্রমুখ ওড়িষ্যার তরুণ কবিরা এই দলের প্রধান ভূমিকায় ছিল। মানবিকতাবোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা রবীন্দ্রসাহিত্যের এই দুই বৈশিষ্ট্য মুগ্ধ করেছিল সবুজ বন্ধুদের। কালিন্দীচরণ তাঁর দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি পুস্তক পাঠের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

সীমা ও অসীমের মিলন, মানবপ্রেম, সৌন্দর্যপ্রিয়তা— রবীন্দ্র সাহিত্যের এই গুণগুলি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ওড়িয়া সাহিত্যের সবুজ যুগের সাধনায় নিমগ্ন কবি মায়াধর মানসিংহকে। তার 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা', এবং 'রবীন্দ্রপূজা'— এই তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অনুশীলনের সূক্ষ্মতা ও মুগ্ধতা প্রকাশিত। প্রগতিবাদী ওড়িয়া কবি সচ্চিদানন্দ রাউত এর সনেট জাতীয় কবিতায় রবীন্দ্র কবিতার অতুল স্পর্শ বেশ বোঝা যায়। উড়িয়া কবি গোপালচন্দ্র মিশ্রের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সবমিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিরিশটি গ্রন্থ আজ পর্যন্ত ওড়িয়ায় অনূদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' সেই গ্রন্থ যা ওড়িষ্যাবাসীকে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে, পক্ষান্তরে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের ভাবজগতের মধ্যে গড়ে ওঠে সে সমন্বয়ের সেতু। ১৯৫০ পরবর্তী ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব সেই অর্থে দেখা যায় না। জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমস্যা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি কিছু কিছু বিষয় কবিতার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে। তবুও বলা যায়, ওড়িশায় রবীন্দ্রনাথ আজও শুধু সাহিত্যিক রূপে নয়, কর্মযোগী ঋষিকল্প শুদ্ধ ব্যক্তিত্বরূপে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী।

Discussion

ভারতাত্মার বাণীসাধক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির তিনি প্রাণপুরুষ। প্রাদেশিক রাজ্যের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। হিন্দি, মারাঠি, উর্দু, তামিল প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যে মুগ্ধ ও প্রাণিত হয়েছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার সঙ্গেও কবির সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে নৈকট্য ও ভাষাগত উৎস বিচারে সহোদর স্থানীয় ভাষা হওয়ায় ওড়িশার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা অনেকটাই সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত। পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক, বালেশ্বরের সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার যোগাযোগগত সুব্যবস্থা, দুই প্রদেশের মানুষের প্রাত্যহিক সংযোগের সেতুসূত্র নির্মাণ করেছে। তাই বাংলার বিশ্ববরেণ্য কবির কাব্যকীর্তি ওড়িশায় জনপ্রিয়তা পাবে, ওড়িশাবাসীর চর্চিত বিষয় হবে এমনটাই স্বাভাবিক। বিশেষত ১৯১৩ খ্রি: নোবেল লাভের পর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ ও কৌতূহল বাড়তে থাকে। ওড়িশায় রবীন্দ্রানুরাগ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায় এই সময় থেকেই। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি বিচিত্র দিক থেকে সংশয়াতীত সাফল্য অর্জন করলেও রবীন্দ্র কবিতাই ওড়িশায় সমধিক পঠিত ও সমাদৃত। তার দুটি কারণ থাকতে পারে—
(ক) রবীন্দ্রনাথ কবিতায় নোবেল খ্যাতি পেয়েছিলেন।
(খ) ওড়িয়া কবিদের দ্বারা পঠিত হয়েছিলেন, তাঁরাই রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করে পরিচিত করিয়েছিলেন সাধারণ ওড়িয়া পাঠকদের কাছে।

পাণ্ডুয়া নামক জমিদারীর কর্তা রূপে রবীন্দ্রনাথ ওড়িশা যাত্রা করেন। সেখানকার স্থাপত্য-শিল্পকলার পরিচয় লাভ করেন। 'সিন্ধুগর্ভ', 'সমুদ্র', 'সিন্ধুতীরে', 'সমুদ্রের প্রতি'—এই বিখ্যাত কবিতাগুলি কবির ওড়িশা বাসের স্মৃতি বহন করে। ওড়িয়া সাহিত্যের ভক্ত কবি মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২)-এর 'ঋষিচিত্র' নামে একটি কবিতা ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'নব ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিতে অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় পেয়ে সপ্রশংস মন্তব্য লেখেন, ঐ সালেই 'সাধনা' পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে। মধুসূদন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। 'উৎকল ব্রাহ্মসমাজে'র (১৮৬৯ খ্রি:) সম্পাদক রূপে বিভিন্ন সভা-সমিতি, পত্রিকা সম্পাদনা ও ব্রাহ্মসাহিত্য রচনায় ওড়িশায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন মধুসূদন রাও। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনে (১৯১১ খ্রি:) এসেছিলেন। নিজের ডায়েরিতে রবীন্দ্র অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে–

"Had a talk with our host about Bengali grammar and some literary and religious matters, listened to some hymns of Rabi Babu's song by Dinendra Babu. Rabi Babu is no more poet and writer only. He has become a tone Saint (Rishi), His humility and faith, his single hearted devotion to the work of ব্রহ্মচর্যাশ্রম, his simple beautiful life impressed me as few lives have done."[১]

ব্রহ্মবাদী মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়। ঔপনিষদিক ভাবনা দুই কবিকেই প্রভাবিত করেছে। মধুসূদনের 'কুসুমাঞ্জলি' (১৯০৩) ও রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) উভয় গ্রন্থেই বিশ্বনিয়ন্ত্রা অসীম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ও অকপটে সর্বস্ব নিবেদনের সুর ধ্বনিত।

মধুসূদনের 'কুসুমাঞ্জলি' রচিত **১৯০৩** সালে এবং 'সঙ্গীতমালা' রচিত **১৯১৮** সাল অর্থাৎ গীতাঞ্জলি প্রকাশের পরে। মধুসূদন রাও এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনের রচনাতে ঈশ্বরের নিকটে যে আত্মনিবেদন, আকুলতা এবং গভীর বিশ্বাস পাওয়া যায় তার মূলে ছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রতি উভয়ের আন্তরিকতা ও আনুগত্য। সমান আধ্যাত্মবাদী মনোভাব ও ব্যক্তিগত জীবনচর্যায় একই প্রকার অনুভব কাব্যবোধের সঙ্গতি এনেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যতর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তাঁর অনুধ্যান ছিল না। সেই আগ্রহ অবশ্য রবীন্দ্রসমকালের সাহিত্যিক মধুসূদনের সহযাত্রী ফকির মোহন সেনাপতি বা রাধানাথ রায়দেরও ছিল না। আবার 'গীতাঞ্জলি'র প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় মানবপ্রেমের উদারতার গভীর অনুভবের শান্তরসের অমূল্য রূপায়নও দেখি না মধুসূদনের রচনায়। শুধু পরমসত্তা জগৎ নিয়ন্ত্রাকে সখা, বন্ধু, প্রাণেশ্বর সম্বোধনে নির্ভরতা ও নিবেদনের সুরটি ধরেছেন মধুসূদন রাও— পরাণ সখা, মহামহেশ, রাজরাজেশ্বর, সূত্রধর প্রভৃতি আহ্বানে কাব্যধর্মের আঙ্গিক নৈপুণ্যের আপাত উদাসীন যে প্রকৌশল নির্লিপ্ত আভরণ রূপে 'গীতাঞ্জলি'র ছত্রে ছত্রে ছড়ানো— সেই উচ্চমাত্রা স্পর্শ করার সাধ ও সাধনার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেও দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে–

গীতাঞ্জলি :

"আনন্দেরই সাগর থেকে/ এসেছে আজ বাণ/
দাঁড় ধরে আজ বোসরে সবাই/ টানরে সবাই টান।"[২]

সঙ্গীতমালা :

"বাজই আহা আনন্দবীণা মহা গগনে
সে মহাতানে ভুবন প্রাণে নাচে সঘনে
তালে তালে রবি চন্দ্রিমা তারা
নাচন্তি ঢালি তা কিরণ ধারা
দ্যুলোক ধারা পুলক ভরা ধ্বনি শ্রবণে।"[৩]

গীতাঞ্জলি :

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।"[৪]

সঙ্গীতমালা :

"আনন্দ সহিত সেহি পরলোক মহালয়ে
আজ যিবা সশরীরে তেজি সকল সংশয়ে
আহা যে অমৃতলোক নাহি যঁহি মৃত্যুশোক
অনন্ত মিলনভূমি সর্ব হৃদয়ে হৃদয়ে।"[৫]

গীতাঞ্জলি :

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে।"[৬]

সংগীতমালা :

> "যাঁহা মুঁ করই, যাহা মুঁ কহই, যাহা মুঁ চিন্তই মনে
> জগত করতা পরম ঈশ্বর জানুছান্তি প্রতিক্ষণে।"[৭]

'গীতাঞ্জলি'র 'পূজা'-পর্যায়ের গীতিসম্ভারের সঙ্গে এই রচনার মিল কষ্টকল্পিত নয়। ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, সাহিত্যস্রষ্টা মধুসূদনের জীবনধারা— রবীন্দ্র জীবনচর্চার সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। তবে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল সূত্র ব্রাহ্ম ধর্ম। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তাই মধুসূদনের তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না।

> "সবুজপরী, আস!
> পত্ররহে কান ডেরি
> ঊর্ধ্বে চাহেঁ ঘাস।
> শীতগলা বনে বনে পল্লব ঝড়াই
> উত্তরা পবনে তার উত্তরী উড়াই।
> দিগে দিগে সংরচিলা শুদ্ধতার শ্বাস
> সবুজপরী, আস!
> যৌবনের মন্ত্রে সখি, জীর্ণ জরা নাশ।"[৮]

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকা এবং ওই পত্রিকায় প্রকাশিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যের ১ম সংখ্যক কবিতা 'সবুজের অভিযান'-এর 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা' কবিতার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ওড়িয়ায় রচনা করেন উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি। ওড়িশার সাহিত্যে রবীন্দ্রানুসরণ তথা রবীন্দ্রপ্রভাব প্রকৃতপক্ষে সবুজ যুগের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর রচনাকর্মে পরিলক্ষিত। অন্নদাশঙ্কর তখন ওড়িশার কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। সেই সময় অন্নদাশংকর রায় কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে ওড়িয়া কবিতার পালা বদলের আশায় সবুজ সাহিত্য সমিতি (১৯১৯ খ্রি:) গঠন করেন। পরে তিনি ও অন্য চারজন সতীর্থ মিলে 'পঞ্চসখা' নাম গ্রহণ করে গড়ে তোলেন 'নন্‌-সেন্স ক্লাব' (১৯২১)। সেই অন্য চারজন হলেন— কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, শরৎ মুখার্জী, হরিহর মহাপাত্র। তাঁদের সাহিত্য মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে হাতে লেখা পত্রিকা 'অবকাশ'। হরিহর নিজের নাম বাদ দিয়ে প্রত্যেকের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই নামকরণ করেন। উদীয়মান প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে উৎসাহিত করেন তৎকালীন প্রখ্যাত 'উৎকল সাহিত্য' ও 'সহকার' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়— বিশ্বনাথ কর এবং লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু। 'সবুজ কবি' নামে পরিচিত হলেন ওই কবিরা। তাঁদের প্রথম রচনা সংকলন 'সবুজ কবিতা' প্রকাশ পেল ১৯৩০ সালে। এখানে অনুমান হয়, 'সবুজ'-নামটি তাঁরা বাংলার সাংস্কৃতিক আবহ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। জড়তা, সংকীর্ণতা, পুরাতন পন্থা ও গোঁড়া মনোভাব ত্যাগ করে নব উদ্দামতা প্রাকৃতিক সবুজের মতো সতেজ প্রাণশক্তিতে জেগে উঠার আহ্বান ছিল রবীন্দ্রনাথের।

ওড়িয়া সাহিত্যে সবুজগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বসমরের মধ্যবর্তী সময়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয় সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে প্রায় সব প্রদেশের সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের প্রতি ওড়িয়া সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ও মনোযোগ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়নি। প্রতিবেশী বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের বেশি উৎসাহ দেখা যায় ১৯২০-২১ সাল থেকে। বাংলা সাহিত্যে তখন বীরবল প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকায় চলছে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, নতুন দিনের আবাহনি-ভাবনা।

'সবুজযুগ'-এর 'সবুজ' শব্দটি প্রতিবেশী বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক আবহ থেকে গৃহীত। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার সঙ্গে সবুজগোষ্ঠীর কবিদের ছিল আত্মিক সংযোগ। অন্নদাশঙ্কর স্পষ্টই জানিয়েছেন—

> "বাংলা, 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'— আমাদের মূল মন্ত্র ছিল।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতায় গতি ও যৌবনের জয়গান করেছেন। জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণের অফুরন্ত ধারায় দুরন্ত-জীবন্ত-অশান্ত-প্রচণ্ড-প্রমত্ত ও প্রমুক্ত হবার জন্য জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল করা
আপন গলার বকুল মাল্যগাছা
আর রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।"[১০]

গতি ও যৌবনের দীপ্তিতে জেগে উঠে জীর্ণজরাকে ঝরিয়ে নতুন প্রাণশক্তির উদ্‌বোধন ছিল 'সবুজ' সাহিত্যের অন্তর-অভিপ্রায়। তারুণ্যের আবেগ-উচ্ছ্বাসে গতানুগতিক জীবনের জড়ত্বের খোলস ছিন্ন করে উদ্দাম প্রাণশক্তির জয়ধ্বজা তুলে ধরাই ছিল তাদের মূল ধর্ম। বৈকুণ্ঠনাথ লিখেছেন—

"কাঁহি কি দুঃখ হতাশে রহু চাঁহি
নবীন তুহি, তরুণ তুহি, আলোক তোর সাথী
দুর্দ্দিনে থরে বিজয়োল্লাসে, উঠিবু কিরে মাতি?
সকল জীর্ণ, সকল জরা কাহিঁ কি চাহুঁ পছে
অর্দ্ধমৃত কেবে কি কাঁহিঁ সবুজ সৃষ্টি রচে?
যৌবনকু দলই কি-এ এমন শক্তি কাহিঁ?"[১১]

সবুজের এই উদ্দাম আবেগ, প্রাণ-শক্তির উন্মাদনায়, যৌবনের অফুরন্ত গতিতে উজ্জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন অন্নদাশঙ্কর তাঁর 'সবুজপরী', 'প্রলয় প্রেরণা', 'সৃজন স্বপ্ন' প্রভৃতি কবিতায়। জনৈক সমালোচকের ভাষায়—

"অন্নদাশঙ্কর তারুণ্যের কবি, প্রণয়-বিহ্বল আবেগময় তরুণ হৃদয়ের অভিব্যক্তিতে এ কবিতাগুলির সার্থকতা। ...তাঁর কবিপ্রকৃতিতে এক ছন্দপ্রাণ, স্বপ্নপ্রাণ, সৌন্দর্যপ্রাণ ও যৌবনাচ্ছন্ন শক্তিধর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।"[১২]

কালিন্দীচরণ তাঁর দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'জীবনস্মৃতি'-প্রভৃতি পুস্তক পাঠের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মানবিকতাবোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা রবীন্দ্রসাহিত্যের এই দুই বৈশিষ্ট্য প্রাণিত করেছিল সবুজ বন্ধুদের। রবীন্দ্র রোমান্টিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় কালিন্দীচরণ, বৈকুণ্ঠনাথের কবিতায় :

ক. "আজি খালি হুঁসিবার ভুলিবার
জোছনার নাচ আজি বারবার
পোছি আস নয়নর লুহ ধার
বিশ্ব হোইছি উল্লসিত যে।"[১৩]

খ. "বধূ আসে মোর ধীর সুললিত
তৃতীয়া জোছনা সম
বড়াএ মো করে কম্পিত কর
সুকুমার অনুপম।"[১৪]

বৈকুণ্ঠনাথের কবিতা :

"জননী বাৎসল্য সম কৌমুদী প্লাবিত গৌণ নিশি
আবৃত করিছি বিশ্ব! দিগ্ বলয়ে যাই অছি মিশি।"[১৫]

এইসব কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'— কাব্যের প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনার অনুভবগত ঐক্য লক্ষ করা যায়। কালিন্দীচরণের 'পুরীমন্দির' কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার সিন্থেসিস বলা যেতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমতত্ত্ব বৈকুণ্ঠনাথের রচনার অন্যতম বিশেষ দিক।

সবুজ যুগের একক সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন কবি মায়াধর মানসিংহ (১৯০৫-১৯৭৩)। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা' এবং 'রবীন্দ্রপূজা'— এই তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-অনুশীলনের সূক্ষ্মতা ও মুগ্ধতা প্রকাশিত। সীমা ও অসীমের মিলন, মানবপ্রেম, সৌন্দর্যপ্রিয়তা— রবীন্দ্র সাহিত্যের এই গুণগুলি আকৃষ্ট করেছিল কবি মায়াধরকে। 'হেমশস্য' (১৯৩৩), 'ক্রুশ' (১৯৫৬), 'কোনার্ক' প্রভৃতি রচনায় তার প্রতিফলন আছে। কবি মায়াধর লিখেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি যুগের একজন বড় কবি নন, তিনি পৃথিবীর কতিপয় শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে একজন, কারণ তাঁর বাণী দিয়ে কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশলাভ করেছে।"[১৬]

নব ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে এভাবেই ওড়িশার কবি অভিনন্দিত করেছেন।

ওড়িয়া কবিতায় মধ্যযুগের বৈষ্ণবীয় ভাবমণ্ডলের সমৃদ্ধ রূপায়ণ সুবিদিত। বিশ শতকের প্রেক্ষিতে সেই ধারাতেই আত্মপ্রকাশ কবি লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্রের (১৮৮৮-১৯৫৩)। ওড়িশায় তিনি 'কান্ত কবি' রূপে সমাদৃত। তাঁর 'জীবনসংগীত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র প্রভাবের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জগতের পরম সত্তার কাছে চরম বিশ্বাস স্থাপন করে জীবনের সকল দুঃখ-সুখকে সমর্পণ করেছেন। নিবেদন ও নির্ভরতায় কবিমন অকপট, আন্তরিক। লক্ষ্মীকান্তও একই সুরে প্রায় একই প্রকার ভাষা ভঙ্গিতে নশ্বর জগতে জীবনের সব অহংকার, সংকীর্ণতা-কলুষ-কালিমা মুছে ফেলে সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন সেই চিরানন্দ ভূমার কাছে। গীতাঞ্জলির সঙ্গে আধ্যাত্মবোধের নিরিখে ভাবগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে জীবনসঙ্গীত-এ। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ চিত্তরঞ্জন দাস লিখেছেন—

> "Most of the saddest and sweetest songs Lakshmikanta wrote were collected together in Jibana Sangita which brings to the reader's mind Rabindranath Tagore's Gitanjali. The two books are so similar in respect their appeal; inner honesty and the sincerity of expression."[১৭]

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' অপেক্ষা মধুসূদনের 'জীবনসঙ্গীত' অধিক ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective)। উভয় সৃষ্টিতে পরম দেবতাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষণীয়। ঝড় ও অন্ধকার রাতে রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তরতমের জন্য অভিসারের অপেক্ষায় অনিদ্র প্রতীক্ষায় থেকেছেন, তেমনি কান্তকবিও।

লক্ষ্মীকান্ত :

> "আজি দীর্ঘ বাদল রাতি,
> গুর গুরু গুরু ঘন গরজন/ দুরুদুরু দুরু ছাতি
> আসুছি কি সতে এ মোর নিশীথে/ আজি মো পরাণ সাথী।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ :

> "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণসখা বন্ধু হে আমার
> আকাশ কাঁদে হতাশ সম/ নাই যে ঘুম নয়নে মম,
> দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,/ চাই যে বারে বার
> পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।"[১৯]

লক্ষ্মীকান্ত :

> "দূর কর মোর যশ অভিমান
> করি দি অ সবু আশা অবসান
> নিবাই দিঅ মো মানস পটরু
> যতেক বাসনা সর্বগ্রাসী।
> তুমরি ইচ্ছা পূর্ণ হেউ হে, হেউ পূর্ণ হে, হেউ পূর্ণ হে,
> মোর সকল বাসনা, সকল কামনা, তব পদে হেউ চূর্ণ হে।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ :

> "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/ চরণ ধূলার তলে।
> সকল অহংকারে হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
> আমারে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে

তোমারই ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ :

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে।
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে অমৃতময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে;
এসো সকল-কর্ম-অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।"[২২]

তুলনীয়,

"শবদ পরশে আসু রূপ রস গন্ধে/ নিতি নিতি নবরূপ ছন্দে।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ :

"সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়নপানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।
স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায় লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।"[২৪]

লক্ষ্মীকান্ত :

"সে পরা আসিথিলা রাতি পাহান্তি
তা লাগি শোইথিলি হোই চাহান্তি
দেখুঁ দেখুঁ দেখি পারিলি নাহি গো
গবাক্ষ ফাঁকে— গলাটি কে' সে।"[২৫]

অথবা,

"কাহিঁকি নিশি শেষে ন জানি কি আবেশে
আসিলা নিদ মাড়ি নয়নে/ নীরবে চাহি
যাইছি সে ফেরি হতাশে।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ :

"কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছে চলে।"[২৭]

লক্ষ্মীকান্ত :

"মোর মোর বোলি ন বুঝি আপে মলি
সবু তোহর/ তোহরি বেদনা তোহোরি প্রাণে
সুবু তোহর সবু তোহর।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথ :

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।
মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।"[২৯]

লক্ষ্মীকান্ত তাঁর আধ্যাত্ম অনুভবের কথা তথা কবিধর্মের মূলভাব ব্যক্ত করেছেন এইভাবে –

"তবে মোটরে কাহিবাকু গলে মোর প্রকৃতি আশাবাদী;
মাত্র অবস্থাচক্ররে মুঁ হোই পড়ে নিরাশাবাদী।
মো ভিতরে এ দুই বাদর সংঘর্ষ মু অনুভব করে।"[৩০]

এই দুঃখ জর্জরিত সংঘাতপূর্ণ অন্তরে 'গীতাঞ্জলি' শান্তির প্রলেপ দিতে পেরেছে। কান্তকবি লক্ষ্মীকান্তর 'জীবনসঙ্গীত'-এর উপরে মত ব্যক্ত করতে গিয়ে অধ্যাপক কৃষ্ণচরণ বেহারা বলেছেন–

"আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যরে রবীন্দ্রনাথঙ্ক অনুকরণ অছি, অনুসরণ বি অছি; কিন্তু সাঙ্গীকরণ প্রায় নাহিঁ। 'জীবনসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথঙ্ক 'গীতাঞ্জলি'র এক যথার্থ সাঙ্গীকরণ।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মীকান্ত উভয়ে ঈশ্বরের সর্বব্যাপক সত্তার উপরে অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। প্রার্থনার ধারা ভিন্ন হতে পারে— সাধনার বিষয় অভিন্ন। তাই উভয়ে এক পথের যাত্রী, এক লক্ষ্যের উপাসক। ভিন্নতার সন্ধানে বলা যায়— রবীন্দ্রনাথের মতো আশাবাদের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা লক্ষ্মীকান্তের কবিতায় পাই না। ব্যক্তিজীবনের দুঃখ, রোগ-শোকের অভিঘাতে আনন্দময় সত্তার সন্ধান বিচলিত মাঝে মধ্যে। তাই লেখেন— 'দৈন্য মোহর চির সহচর/ অভাব মোহর প্রাণর সোদর।' বিপর্যয়পূর্ণ জীবন-প্রবাহকে যে তিনি অতিক্রম করে মাঝে মাঝে নবরূপে নবছন্দে জেগে উঠেছেন সে তো গীতাঞ্জলির পুণ্যস্পর্শে। আর এখানেই বলা যায়—রবীন্দ্রনাথের মতো মানসশক্তির অর্জন দুর্লভ যে শত ঝঞ্ঝায় দুর্বিপাকেও শুনতে পাবেন— 'জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'।

এই ধরনের মিল থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মতো লক্ষ্মীকান্ত জগৎ নিয়ন্ত্রার প্রতি সর্বত্র ও সর্বদা অটল বিশ্বাস ও নিশ্চিত নির্ভরতায় অবিচল থাকতে পারেন নি। নিরাশার দহনে দগ্ধ হয়েছেন।

প্রগতিবাদী ওড়িয়া কবিতায় সচ্চিদানন্দ রাউৎ রায়ের নাম সুপরিচিত। ওড়িয়া আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃত তিনি। কবি জীবনের প্রথম পর্বে একগুচ্ছ সনেটের (অর্ধশত) সংকলন প্রকাশ করেন— 'পাথেয়' (১৯৩১) নামে। একটি কবিতায় লিখেছেন—

"সকল তেজি মুঁ আসিছি তুমর দ্বারে
হে জীবন প্রিয়, গোপন অভিসারে।
শূন্য মো পাত্র ভরি দিঅ তব দানে

নীরব মো বীণা বাজি উঠু তব গানে।"[৩২]

পঙ্‌ক্তিগুলিতে রবীন্দ্র সাহিত্যের স্পর্শ বেশ বোঝা যায়। পরবর্তীকালে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটে। 'রাজজেমা'-কবিতায় নিজের কাব্যাদর্শের স্বাতন্ত্র্য জানিয়ে লিখেছেন— 'মুঁ সচ্চি রাউৎরা, নুহে টাগোর বা শেলী।'

কবি গোপালচন্দ্র মিশ্রের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। নিরাশা ও ব্যর্থতার মধ্যেও সৃষ্টির চারণ গীতি ও সার্থক প্রেরণা অনুভব করেছেন—

"যে ফুল ন ফুটি বৃক্ষে রহি রহি যাএ,
যে নদী উষর বক্ষে যাএ হজি হজি,
যে ঝর করই আত্মহত্যা সিকতারে
বেদনা বীণার তারে ব্যথা সভু যাএ।"[৩৩]

১৯৫০ খ্রি: পরবর্তী ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব তেমন দেখা যায় না। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমস্যা ও ঘটনার প্রতি সদা জাগ্রত কৌতূহল কবিতার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা আধুনিক কাব্যধারা— ওড়িয়া কবিদের প্রভাবিত করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ওড়িয়া পাঠকদের কাছে একান্ত আপনজনরূপে অভিনন্দিত। তাঁর অনেক গল্প, কবিতা ও কথাসাহিত্য ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে সেগুলি যথেষ্ট সমাদৃত। আবার সরাসরি বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করেন অনেকেই। ওড়িশায় রবীন্দ্রনাথ আজও শুধু সাহিত্যিক রূপে নয়, কর্মযোগী ঋষিকল্প শুদ্ধ ব্যক্তিত্বরূপে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী।

তথ্যসূত্র :

১. দেবী, অবন্তী, ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ, গ্রন্থমন্দির, কটক-২, ১৯৯৩, পৃ. ৯৭
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ১৭
৩. ভক্তকবি মধুসূদন রচনাবলী, ৫নং কবিতা, গ্রন্থমন্দির, কটক-২, ১৯৮৮, পৃ. ১৬
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ৪৩
৫. ভক্তকবি মধুসূদন রচনাবলী, ৯৮নং কবিতা, গ্রন্থমন্দির, কটক-২, ১৯৮৮, পৃ. ৭৭
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ১৩
৭. ভক্তকবি মধুসূদন রচনাবলী, বর্ণবোধ, গ্রন্থমন্দির, কটক-২, ১৯৮৮, পৃ. ১৯৬
৮. রায়, অন্নদাশঙ্কর, সবুজপরী, সবুজঅক্ষর প্রকাশনী, কটক, কিতাব মহল, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৮
৯. রায়, অন্নদাশঙ্কর, সাহিত্যস্মৃতি, সবুজঅক্ষর প্রকাশনী, কটক, কিতাব মহল, ১৯৮৮, পৃ. ২৫০
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ২৪৪
১১. মহাপাত্র, হরিহর, বৈকুণ্ঠনাথ সাহিত্য ও সবুজ কবিতা, জিজ্ঞাসা পত্রিকা (সম্পাদক- শিবনারায়ণ রায়), ৫ম বর্ষ, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০
১২. পণ্ডা, হৃষিকেশ, রবীন্দ্র সমকালীন ওড়িয়া কবিতা, কটক, ওড়িশা বুক স্টোর, ১৯৮৮, পৃ. ৩৩৫
১৩. শতপথী, নিত্যানন্দ, সবুজ কবিতা সংকলন, ফগুনবংশী, গ্রন্থমন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ২৩৫
১৪. শতপথী, নিত্যানন্দ, সবুজ কবিতা সংকলন, মধুবিবাহ, গ্রন্থমন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭৮
১৫. হরিহর মহাপাত্র, জীবনপঞ্জিকা, উৎকল সাহিত্য, গ্রন্থমন্দির, কটক-২, ১৯৯৩, পৃ. ১৩১
১৬. মানসিংহ, ড. মায়াধর, ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস, গ্রন্থমন্দির, কটক, সপ্তম সংস্করণ- ১৯৯৬, পৃ. ২৯
১৭. Das, Chittaranjan, A Glimpse into Oriya Literature, Bhubaneswar, 1982, p. 209

১৮. কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত রচনাবলী, ওড়িশা সাহিত্য আকাদেমী, ভুবনেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ৫২
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ২৪
২০. কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত রচনাবলী, জীবনসঙ্গীত, ওড়িশা সাহিত্য আকাদেমী, ভুবনেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ২২৮
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ১৩
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ১৬
২৩. কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত রচনাবলী, জীবনসঙ্গীত, ওড়িশা সাহিত্য আকাদেমী, ভুবনেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ২৪২
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ৫০
২৫. কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত রচনাবলী, জীবনসঙ্গীত, ওড়িশা সাহিত্য আকাদেমী, ভুবনেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ৮১
২৬. কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত রচনাবলী, জীবনসঙ্গীত, ওড়িশা সাহিত্য আকাদেমী, ভুবনেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ৮৫
২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ৫০
২৮. কান্তকবি লক্ষ্মীকান্ত রচনাবলী, জীবনসঙ্গীত, ওড়িশা সাহিত্য আকাদেমী, ভুবনেশ্বর, ২০০৫, পৃ. ১০৩
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ), প্রকাশক, অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ৮৬
৩০. বক্কা ও সিধা, বালা স্বাইঁ, জানুয়ারি, ১৯৬৩, পৃ. ২৪৮
৩১. মহারানা, সুরেশ কুমার, ওড়িআ সাহিত্যর ইতিহাস, ওড়িয়া বুক স্টোরস্‌, কটক-২, ২০০১, পৃ. ২২
৩২. আচার্য, গৌরমোহন, সচ্চিদানন্দের সনেট : সনেটের সচ্চিদানন্দ, দেব প্রকাশনী, কটক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩২, পৃ. ১৭৪
৩৩. মিশ্র, গোপালচন্দ্র, ব্যর্থজীবন, সহকার, উৎকল পাবলিশার্স, ভুবনেশ্বর, প্রথম প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪